বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.009

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

নাজনীন সুলতানা*

সারসংক্ষেপ

১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দেয়। সামরিক শাসন উচ্ছেদের জন্য এ সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দল ও জাতীয়তাবাদী দলের উদ্যোগে ৮ দলীয় জোট গড়ে উঠেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ১৫ দলীয় জোটের শরীক একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষকদের সমন্বয়ে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত কৌশল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাদের জোটবদ্ধ ধারাবাহিক আন্দোলনে সাফল্য এসেছিল, অবসান ঘটেছিল জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্বৈরশাসনের। বর্তমান প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চাবি শব্দ : কমিউনিস্ট পার্টি, এরশাদ শাসনামল, বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-১৯৮৯)।

ভূমিকা

১৯৮০-এর দশক বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সংকট ও পরিবর্তনের একটি যুগ। সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনে দেশ স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বারবার লঙ্ঘিত হয়। এরশাদবিরোধী গণআন্দোলন ছিল সমাজের নানা স্তরের মানুষের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের প্রতিফলন। এ আন্দোলনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করে। এ দল শুধু স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি; বরং জনগণকে সংগঠিত করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মধ্যস্থতা ও ঐক্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে যেন ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষকদের সমন্বয়ে এক বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ দল স্বৈরাচার বিরোধিতার পাশাপাশি নতুন সমাজ নির্মাণের আদর্শ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে সাধারণ মানুষের মধ্যে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এ প্রবন্ধে এরশাদ

* সহকারী শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, প্যারামাউন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী।

সরকারের শাসন ব্যবস্থার প্রতিবাদ এবং গণতান্ত্রিক চেতনার পুনর্জাগরণে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ও অবদানের বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রকৃতি, ১৯৪৮-১৯৮২

১৯৪৮ সালে কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) দ্বিতীয় কংগ্রেসে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিপি) গঠিত হয়।[১] এটি ছিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি। সিপিআই-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বি.টি. রণদীভের নেতৃত্বে, সিপিপি ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত লেনিনবাদী কৌশলের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে, যা তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের মতো ঘটনার প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তবে, এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর, তারা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ শুরু করে, শ্রমিক ও ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।[২]

১৯৫২ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন যে উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়, এবং সিপিপি এই ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে যুক্ত হয় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে জোরালো অবস্থান নেয়।[৩] তোয়াহা, ওলি আহাদ, দেওয়ান মাহবুব আলী এবং সমাদের মতো কমিউনিস্ট নেতারা এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন, যা বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনে সিপিপি আওয়ামী লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি এবং নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির সমন্বয়ে গঠিত ইউনাইটেড ফ্রন্টকে সমর্থন করে।[৪] এই নির্বাচনে সিপিপি'র দশ জন প্রার্থীর মধ্যে চার জন হিন্দু আসনে জয়ী হন, এবং আরও ২৩ জন অন্যান্য দলের টিকিটে নির্বাচিত হন।[৫] তবে, ১৯৫৪ সালে সরকার সিপিপি এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলো, যেমন ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন, প্রগ্রেসিভ রাইটার্স মুভমেন্ট এবং রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে নিষিদ্ধ করে। এর ফলে সিপিপি গোপনে কার্যক্রম চালিয়ে যায়।

১৯৫০-এর দশকে সিপিপি'র সাফল্য সীমিত থাকলেও, ১৯৬০-এর দশকের প্রথম থেকে তারা আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের ছাত্র সংগঠন, ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে সক্রিয় ছিল।[৬] সিপিপি আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলনকে সমর্থন করে, যা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরে।[৭] ১৯৬৮ সালে, রাশেদ খান মেনন এবং মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ইউনিয়নের দুটি শাখা এবং ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস লীগ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে এবং ১১ দফা প্রোগ্রাম ঘোষণা করে, যা শিক্ষা সংস্কার, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে, সিপিপি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, তাদের অনেক নেতা ও কর্মী আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।[৮]

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর, কমিউনিস্ট পার্টি শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে সমর্থন করে। তাদের প্রভাবে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠিত হলে, কমিউনিস্ট পার্টি তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলীন করে বাকশালে যোগ দেয়।[৯] মুজিবের হত্যার পর, জিয়াউর রহমানের শাসনামলে কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে তাঁর খাল খনন কর্মসূচিকে সমর্থন করে, কিন্তু পরে জিয়া তাদের নিষিদ্ধ করেন।[১০] তবে, আদালতের মাধ্যমে তারা আবার বৈধতা ফিরে পায়। ১৯৮২ সালে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় এলে, কমিউনিস্ট পার্টি তার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নেয়।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর অধিকাংশ বিরোধী দল সংসদীয় সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরিবর্তে 'সার্বভৌম সংসদ' নির্বাচনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু এসকল দাবি উপেক্ষা করে শাসক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আয়োজন করে। এই নির্বাচনে মোট ৩১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী বিচারপতি সাত্তার ৬৫.৫২% ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাত্র ১২৮ দিন পর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল এইচ.এম.এরশাদ। তিনি সারা দেশে সংবিধান স্থগিত করে সামরিক আইন জারি করেন। সামরিক আইন জারি হওয়ার ফলে রাজনৈতিক তৎপরতাও বন্ধ হয়ে যায়।[১১] সামরিক শাসন শুরুর দুই দিন পর সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের মিলানায়তনে সামরিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বক্তৃতায় জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ সামরিক আইন জারির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন,

> We will stay in power for about two years and then hand over power to a political party but obviously not to Awami League as Awami League will destroy the Armed Forces.[১২]

এ সময় তিনি প্রতিটি সেনানিবাস সফর করেন এবং সেনা সদস্যদের উদ্দেশে রাজনৈতিক বক্তৃতা দেন। নিজের ক্ষমতা গ্রহণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে নিজের রাজনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করেন।

আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্য

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সংকটজনক অবস্থা থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি বামদলীয় মোর্চা

গঠন করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু বামদলগুলো বিভিন্ন ইস্যুতে নিজেদের মধ্যে প্রবল মতভেদ থাকায় এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষে কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। কমিউনিস্ট পার্টি উদ্যোগী হয় ১৫ দলীয় ঐক্য জোট গঠন করতে। আর ১৯৮৩ সালে গড়ে ওঠা ১৫ দলীয় জোটে আওয়ামী লীগের পরেই শক্তিশালী অবস্থানে ছিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৫ দলীয় জোটে বিএনপি যোগদান করেনি তাদের আদর্শিক ভিন্নতার জন্য। বিএনপির নেতৃত্বে পৃথক ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়। এই জোটে ছিল বিএনপি (সাত্তার-খালেদা জিয়া), ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (কাজী জাফর), গণতান্ত্রিক পার্টি (নুরুল হুদা মির্জা-সিরাজুল হোসেন খান), বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান), কৃষক শ্রমিক পার্টি (নান্না মিয়া), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নুরুর রহমান) এবং বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ (টিপু বিশ্বাস)।[১৩]

উল্লেখ্য, এ সময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দুই জোটকে (১৫ দলীয় ও ৭ দলীয়) ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। যদিও কমিউনিস্ট পার্টি ১৫ দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পার্টির এই লিঁয়াজো প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল, এরশাদ শাসন বিরোধীদের শক্তিশালী করা। পার্টি এই লিঁয়াজো প্রক্রিয়ার দ্বারাই সরকার বিরোধী শক্তিসমূহকে সমবেত করে।[১৪] ১৫ দলীয় জোট গঠনকে কেন্দ্র করে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাতে বলা হয়,

> বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছে যে, দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ক্রমে সংকট আরো গভীর হচ্ছে। দেশের বাস্তব আর্থ-সামাজিক অবস্থা যা সৃষ্টি হয়েছে দুই শতাব্দীর অধিককাল ধরে ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ এবং যুগ যুগ ধরে সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মৌলিক সংস্কারের অভাব থেকে দাবি করছে সমাজতন্ত্র অভিমুখী সামাজিক বিপ্লব। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব গড়ে তোলা আজ ঐতিহাসিকভাবে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।[১৫]

এভাবে জোট গঠিত হবার পর সরকার বিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬০ দশকের মতো প্রথমে ছাত্রকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়।[১৬]

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য জোটের রাজনীতি

১৯৮২ সালে এরশাদ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খান একটি প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছিলেন। এ শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন এরশাদ শাসন বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। ১৯৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষাদিবস পালন করা হয়, সামরিক শাসন বিরোধী দিবস হিসেবে। এটি ছিল জেনারেল এরশাদ বিরোধী প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। এরপর ১৯৮৩ সালের ১ জানুয়ারি ছাত্রদের পক্ষ থেকে ব্যাপক বিক্ষোভের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।[১৭] ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা সচিবালয় অভিমুখে মিছিল বের করে এবং মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে

কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়।[১৮] পুলিশ ও বিডিআর বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে রাখে। এর প্রতিবাদে ১৯৮৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি, মৌন মিছিল এবং ২০ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালনের ডাক দেওয়া হয়।

এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এরশাদ শাসন বিরোধী আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে কাজে লাগায়। এ সময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সরকার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য কতকগুলো নীতি গ্রহণ করে। এগুলি ছিল নিম্নরূপ :

ক) পার্টি 'জাতীয় উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং জনগণের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্র অভিমুখীন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করার নীতি অনুসরণ অব্যাহত রাখবে।

খ) স্থায়ীভাবে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হলে আন্দোলন সংগ্রামের ধারায় এগিয়ে যাওয়ার নীতি অব্যাহত রাখা হবে।

গ) বিপ্লব সম্পাদনের জন্য বিপ্লবের পক্ষের প্রধান শক্তিসমূহকে (শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, কৃষক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী) নিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা হবে।[১৯]

উপর্যুক্ত নীতিসমূহ আন্দোলনের ধারায় প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ দলীয় জোট প্রতিবাদ সভা করতে থাকে।

এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষা আন্দোলন ছাড়াও আরো দুইভাবে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথমত, জোটবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা; দ্বিতীয়ত, রাজপথে থেকে লড়াই করা।[২০] বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির একক প্রচেষ্টায় শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, ছাত্র, যুবক, নারী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবীদেরকে আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণি তাদের শ্রেণি আন্দোলনের সাথে সাথে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখার জন্য 'ঐক্য পরিষদ' গঠন করে। একমাত্র সরকারি ফেডারেশন ছাড়া প্রায় সকল ফেডারেশন 'ঐক্য পরিষদে' যোগ দেয়। এমনকি বিএনপি সমর্থক শ্রমিক সংগঠনও ঐক্য পরিষদে যোগ দেয়। উল্লেখ্য, যে সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হয় তাদের অনেকেরই তেমন কোনো গণভিত্তি না থাকলেও ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই 'ঐক্য পরিষদ' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবে দেখা যায়,বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শ্রমিক আন্দোলন ছাড়াও ছাত্র আন্দোলন, গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুরদের নানা সংগ্রাম, সমাজের অন্যান্য স্তরের জনগণের আন্দোলনও এ সময় ক্রমেই বেগবান হয়ে উঠতে থাকে।[২১] ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ৫ দফা দাবিতে ১৯৮৪ সালের ২২ মে থেকে ৪৮ ঘন্টাব্যাপী হরতাল পালন করে। জনজীবন বিপর্যস্ত ও সরকারের জনসমর্থন হারানোর ভয়ে জেনারেল এরশাদ এ সময় শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবিসমূহ পরীক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানকে নির্দেশ দেন। শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে আলোচনা শুরু হয়। ক্রমাগত দুই দিন

আলোচনা শেষে সরকার শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের প্রায় সব দাবিই মেনে নিয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।[২২] এভাবে কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন আংশিকভাবে হলেও সফল হয়।

এ সময় কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিরোধী দলের আন্দোলনে সফলতা আসে উপজেলা নির্বাচন বন্ধ করতে পারার মধ্য দিয়ে। উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকার পুনরায় রাজনৈতিক বিধিনিষেধ জারি করে। এর পর পরই ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ হরতাল আহ্বান করলে তার আগের দিন ছাত্র সমাজ মিছিল বের করলে ছাত্রনেতা সেলিম এবং দেলোয়ার পুলিশের ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। হরতাল চলাকালে আদমজীতে নিহত হন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী তাজুল ইসলাম। এতে করে ১৫ দলীয় জোটসহ সকল জোট অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে সরকার উপজেলা নির্বাচন স্থগিত করতে বাধ্য হয়।[২৩]

এ পর্যায়ে কৌশল হিসেবে স্থির করা হয় তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৮৪ সালের মধ্যেই সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করতে বাধ্য করা। এ উদ্দেশ্যে ১৫ দলীয় জোট একটির পর একটি হরতাল এবং ১৪ অক্টোবর গণসমাবেশের ডাক দেয়। এই গণসমাবেশ কেবল দেশে নয়, বিদেশেও আলোড়ন সৃষ্টি করে।[২৪] এ অবস্থায় জেনারেল এরশাদ তাঁর ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য গণভোটের ব্যবস্থা করেন। গণভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর রাতের বেলা সান্ধ্যআইন জারি করা হয়।[২৫] এ সময় বিরোধী দলের ৫১৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।[২৬]

গণভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়,

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের সংঘর্ষ ও ছাত্র হত্যার উত্তেজনা সত্ত্বেও আমরা ধৈর্য্য ধরে নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু জঙ্গী সরকার নির্বাচন বাতিল করেছে। এ থেকে তাদের অসৎ উদ্দেশ্যের প্রমাণ মেলে এবং তারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সমগ্র দেশকে বৃহত্তর হাঙ্গামার পথে ঠেলে দিয়েছে... সমস্ত রকম জুলুম বজায় রেখে এরশাদ গণভোটের প্রহসন করছেন। এ পথেই তিনি তাঁর বেআইনী শাসনকে আইনী করতে চান। জনগণ তাঁর এই অপচেষ্টাকে রুখবে। কিছুতেই তারা এই গণভোটে অংশ নিবে না।[২৭]

১৫ দল শেষ পর্যন্ত ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চের গণভোটকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য মতে, গণভোটে ৭১ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এতে প্রায় ৯৫ শতাংশ ভোট জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের পক্ষে পড়ে।[২৮]

১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোটে জয়লাভের পর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ স্থগিত থাকা উপজেলা নির্বাচনের নতুন তারিখ ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০ মে নির্ধারণ করেন।[২৯] ১৯৮৫ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ১৫ দলের সঙ্গে যৌথভাবে উপজেলা নির্বাচন প্রতিহত করার ডাক দেয়। উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাকর্মীসহ প্রায় ৪০০ কর্মী আহত এবং ১৪ জন নিহত

হন। উপজেলা নির্বাচনের সহিংসতা অনেক বেড়ে যায় এবং ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০ মে সংঘর্ষে ১৪৮টি ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়।[৩০] এভাবে গোলযোগময় অবস্থার মধ্যদিয়ে উপজেলা নির্বাচন সম্পন্ন হয়। শেষপর্যন্ত নির্বাচন বন্ধ করতে ব্যর্থ হলেও কমিউনস্ট পার্টি নির্বাচন প্রতিরোধের জন্য মাঠে সক্রিয়ভাবে তৎপর ছিল।

১৯৮৬ সালের নির্বাচন

জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ ১৯৮৫ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে আরো এক বছরের জন্য তাঁর কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করেন। ইতঃপূর্বে আরো দুই বার জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে ছিলেন।[৩১] নিজের চাকুরীর মেয়াদ বাড়িয়ে দশে গণতান্ত্রকি ব্যবস্থা প্রতষ্ঠার জন্য স্বচষ্টে হন জনোরলে এরশাদ, যার লক্ষ্য ছলি নজিরে রাজনতৈকি দল জাতীয় পার্টকিে ক্ষমতায় আনা। সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল তাঁর এই নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হবার অপতৎপরতা রুখে দেবার জন্য সক্রিয় হয়।

উপজেলা নির্বাচনের পর ১৫ দলীয় জোটের মধ্যে উদ্যমী মনোভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। এ সময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্ব উদ্যোগে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আয়োজিত মে দিবসে শ্রমিকদের মিছিল করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু খুব দ্রুত কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার ইস্যু পেয়ে যায়।

১৯৮৫ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চটকল শ্রমিকদের ৩৬ দিনব্যাপী ধর্মঘট এবং আদমজীর শ্রমিকদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের কারণে পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। ১৫ দল আদমজীর শ্রমিক আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। এ সময় বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের স্তব্ধতা কাটাতে সহায়ক হয়। ১৯৮৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মানিক মিয়া এভিনিউতে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অবিলম্বে সংসদ নির্বাচন আয়োজনরে দাবি করা হয়। সমাবেশে আরো দাবি করা হয়, দুই নেত্রীকে ১৫০:১৫০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দান করার। উল্লেখ্য, নির্বাচন নিয়ে জোটের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয় এবং সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব ঘটে। এ সুযোগে জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ দ্রুততার সাথে সংবিধান সংশোধন করে একজন প্রার্থীকে পাঁচটির বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করতে না-পারার বিধান সংযোজন করেন। ফলে দুই নেত্রীর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে স্বৈরশাসককে মোকাবিলা করার সুযোগ আর থাকে না। তারপরও ১৫ দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৩২]

সংসদ নির্বাচনে আসন বণ্টনকে কেন্দ্র করে ১৫ দলীয় জোটের বিরোধ অব্যাহত থাকে এবং তা ভাঙ্গনে রূপান্তরিত হয়। ৫ বামদল ১৫ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে যায়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী লীগ, উভয় ন্যাপ, বাকশাল, সাম্যবাদী দল, জাসদের একাংশ (শাজাহান সিরাজ), ওয়ার্কার্স পার্টি (নজরুল) ও গণ আজাদী লীগ নির্বাচনের পক্ষে থাকে। তবে বাকশাল ও

জাসদ (শাজাহান-সিরাজ) শেষ মুহূর্তে নির্বাচন বর্জন করে। এভাবে ১৫ দলীয় জোট ১৯৮৬ সালে সংসদ নির্বাচনের সময় ৮ দলীয় জোটে পরিণত হয় এবং ১৯৮৬ সালের ১১ এপ্রিল নির্বাচনী মোর্চা গঠন করে।[৩৩]

১৯৮৬ সালের ১২ এপ্রিল শনিবার সকালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যালয়ে ৮ দলীয় নির্বাচনী মোর্চার নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারনায় জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাই নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে ব্যাপক গ্রেফতার শুরু করেন।[৩৪] বায়তুল মোকাররম এলাকা থেকে ৪১ জনকে গ্রেফতার করা হয়।[৩৫] সারাদেশে সন্ত্রাস, হাঙ্গামা ও বোমাবাজির মধ্য দিয়ে ১৯৮৬ সালের ৭ মে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৩৬] নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে জাতীয় পার্টি ১৫৩; আওয়ামী লীগ ৭৬, জামায়াতে ইসলামী ১০, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ৫টি আসন লাভ করে।[৩৭] এ নির্বাচনে যোগ দিয়ে দল ১৯৫৪ সালের পর সবচাইতে বড় সাফল্য অর্জন করে। নির্বাচনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ৫ জন প্রার্থী বিজয়ী হন। পরে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ওহিদুর রহমান বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করায় দলের নির্বাচিত সংসদ সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৬। এছাড়া সহযোগী দল ন্যাপের ৭ এবং ওয়ার্কার্স পার্টির ৩ জন সদস্য নির্বাচিত হন। এ নির্বাচন সম্পর্কে পরবর্তীতে দলীয়ভাবে মূল্যায়ন করে বলা হয় :

> এ নির্বাচন এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে আমাদের পার্টির সামগ্রিক ভূমিকা, তৎপরতা ও আন্দোলনের বাস্তব অবদান। এ নির্বাচন পার্টির দলীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে পার্টি রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে উপনীত হয়েছে।[৩৮]

এভাবে দেখা যায় আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি যে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করে অগ্রসর হয়, তাতে সাফল্য আসে। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে দলের সাফল্য দলীয় সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধি করে।

১৯৮৬ সালের নির্বাচন সম্পর্কে পার্টির পর্যালোচনা হলো, 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সামরিক শাসন বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রথম থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ... এ নির্বাচনে অত্যন্ত সতর্কভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এবারও পরিস্থিতি বেশ জটিল ছিল। তা সত্ত্বেও ভোটের প্রকৃত ফলাফলে দেখা যায় বেশির ভাগ মানুষ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণরায় প্রদান করেছে।'[৩৯]

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি আরো মন্তব্য করে, ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচন দ্বারা সরকার পক্ষকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভোটের প্রকৃত ফলাফল ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। সরকার সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে ভোট ডাকাতি এবং মিডিয়া ক্যুয়ের মাধ্যমে সংসদে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।[৪০]

১৯৮৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

উপজেলা নির্বাচন ও সংসদ নির্বাচনের পর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ বৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। তিনি রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলির কর্মীদের উদ্দেশে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কেউ বিরোধিতা করলে তার সাত বছর কারাদন্ড হতে পারে। নির্বাচনের মাত্র দুই দিন আগে অর্থাৎ ১৯৮৬ সালের ১৩ অক্টোবর এরশাদ সরকার প্রায় ২০০০ নির্বাচন-বিরোধী কর্মীকে গ্রেফতার করেন এবং পুলশিকে বিরোধী দলের প্রথম সারির নেতাদের ওপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেন।[৪১]

বাংলাদেশের বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক মোর্চা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বয়কট করলেও এ নির্বাচনের প্রার্থী ছিলেন মোট ১৬ জন। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ৫ জন কর্মী নিহত এবং তিনশতাধিক কর্মী আহত হন।[৪২]

নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি ছিল একেবারে নগণ্য। বিদেশী সাংবাদিকদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য মাত্র ১০-১৫ শতাংশ ভোটদাতা হাজির হয়। জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে বলেন, 'বিরোধী দলগুলি নির্বাচন বানচাল করে দিবে বলে দাবি করেছিল। কিন্তু আমরা সফলভাবে নির্বাচন করতে পেরেছি। এটাই এই নির্বাচনের বিশ্বাস যোগ্যতা প্রমাণ করে। যদি ভোটদাতার সংখ্যা শতকরা ৩ জনও হয় এবং তাদের বেশির ভাগই আমার পক্ষে ভোট দিয়ে থাকেন তা হলে ঐ অধিকাংশের ভোটে আমি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছি।'[৪৩]

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ১৯৮৬ সালের ২৩ অক্টোবর জেনারেল এরশাদ পাঁচ বছরের জন্য বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর জাতীয় সংসদ দুই তৃতীয়াংশের ভোটে ইনডেমনিটি বিল পাস হয়। ফলে বিগত চার বছরেরও বেশি সময় সামরিক শাসনামলে যে সকল সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল সেগুলো বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি বিল গৃহীত হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সামরিক আইন প্রত্যাহার করনে।[৪৪]

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৮০ সালের তৃতীয় কংগ্রেসের পর থেকে চতুর্থ কংগ্রেস পর্যন্ত অর্থাৎ গোটা আশির দশকই রাজনৈতিক দিক থেকে অস্থিতিশীল ছিল। সে সময় সামরিক শাসক জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলন করার পাশাপাশি বাংলাদেশের

কমিউনিস্ট পার্টি চতুর্থ কংগ্রেসের আয়োজন করে। ১৯৮৭ সালের ৭ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল মোট পাঁচ দিনব্যাপী চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। এ কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের আব্দুস সামাদ আজাদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সৈয়দ আলতাফ হোসেন, বাকশালের আব্দুর রাজ্জাক, সাম্যবাদী দলের মোহাম্মদ তোয়াহা ও গণআজাদী লীগের আব্দুস সামাদ। এ কংগ্রেসে ভারত, হাঙ্গেরী, ভিয়েতনাম, সাইপ্রাস, প্যালেস্টাইন, মঙ্গোলিয়া, চেকোশ্লোকাভিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেন। এছাড়া কংগ্রেস উপলক্ষ্যে সারা বিশ্বের প্রায় সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বাণী পাঠায়। কেন্দ্রীয় কমিটির ৩২ জন সদস্যসহ কংগ্রেসে যোগদানকারী প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৮৮৯ জন। কংগ্রেসে ঐক্য জোটের প্রায় সকল নেতাই উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগের আব্দুস সামাদ আজাদ থেকে শুরু করে এ সময়কার কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সাম্যবাদী দলের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তোয়াহাও এ কংগ্রেসে উপস্থিতি থাকনে।[৪৫] এ কংগ্রেসে পার্টির সাংগঠনিক রিপোর্টও পেশ করা হয়। এটি পেশ করেন নূরুল ইসলাম নাহিদ। সাংগঠনিক শক্তি সম্পর্কে এই রিপোর্টে বলা হয় :

> চতুর্থ কংগ্রেস সামনে রেখে অনুষ্ঠিত জেলা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে ৬০টি জেলা সংগঠন গঠিত হয়েছে। তৃতীয় কংগ্রেসের সময় এই সংখ্যা ছিল ২৮টি। ১৯৮৫ সালে ৫টি জেলা সংগঠনকে আলাদা করা হয়। পার্টি সদস্যের সংখ্যা, সাংগঠনিক অবস্থা, নেতৃত্বের সবলতা-দুর্বলতা প্রভৃতি বিবেচনায় এনে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগরসহ ৩৮টি জেলা কমিটি, ৫টি জেলা সাংগঠনিক কমিটি ও ১৭টি জেলা শাখা কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রশাসনিক জেলাগুলোর মধ্যে ৭টিতে এখনও আলাদা জেলা সংগঠন গঠন করা সম্ভব হয়নি।[৪৬]

এই কংগ্রেসে জাতীয় পরিস্থিতি ও বিশ্লেষণ করে বলা হয় :

> ...বহু সংগ্রামের ফলে অর্জিত স্বাধীনতার সুফলগুলো আজ নস্যাৎ হয়ে গেছে। দেশের ভেতরে সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর ধনবাদী সমাজধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র জাতির উপর নয়া উপনিবেশিক শোষণের শৃঙ্খল দৃঢ়মূল হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী আমলা মুৎসুদ্দী লুটেরা ধনিকের স্বার্থের অনুকূলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাসমূহ আরো গভীর করা হচ্ছে।[৪৭]

১৯৮৭ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস রিপোর্টে পার্টির নেতা কর্মীদের উদ্দেশে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। ক্ষমতাসীন সরকার এদেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী। এ কারণে দেশের অর্থনীতি-রাজনীতি এবং সমাজ জীবনে সর্বত্র গভীর সংকট দেখা দিয়েছে। তাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় স্বাধীনতাকে সংহত করে স্বাধীনতার অপূর্ণ কাজকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে বলে ঘোষণা করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির মতে, দল ১৯৮২ সাল থেকে হরতাল, মিছিল, সমাবেশ করে দেশবাসী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণরায় প্রদান করেছে। কিন্তু সামরিক শাসকের শাসনের পতন ঘটেনি। এই অবস্থায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি পূর্বের রণনীতি ছাড়াও একটি সঠিক রাজনৈতিক রণকৌশল

গ্রহণ করে সংগঠিত শক্তি ও জনসমর্থন নিয়ে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করে তোলা উচিত বলে কমিউনিস্ট পার্টির এই দলিলে ঘ◌োষণা করা হয়।[৪৮]

চতুর্থ কংগ্রেসের রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের শাসনামল সম্পর্কে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন পরিবর্তন আসেনি। আওয়ামী লীগ সম্পর্কেও তাদের পূর্ব ধারণা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে পূর্বরে সমাজতান্ত্রকি বিপ্লবের ধারা অক্ষুণ্ন রাখা হয়। আর এ ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার পক্ষে থাকে।[৪৯]

১৯৮৭-৮৮ গণ আন্দোলন ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচন ও ১৯৮৭ সালের চতুর্থ কংগ্রেসের পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য কিছু সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। মূলত, গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ লেনিনবাদী সাংগঠনিক নীতিমালা সুনির্দিষ্ট করার জন্যই কেন্দ্রীয় কমিটি এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

এ সময় সামরিক আইন প্রত্যাহার করায় দেশের রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে এবং এ ব্যাপারে আরো বেশি সংঘবদ্ধ হয়।[৫০] ১৯৮৭ সালের জুন মাসে এরশাদ সরকার নতুন বাজেট ঘোষণা করলে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এই বাজেটকে 'গরীব মারার বাজেট' বলে আখ্যায়িত করে এবং বাজেটের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। তারা ৮ দলীয় জোটের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ২৪ ঘণ্টার হরতাল পালন করে।[৫১] ১৯৮৭ সালের ১২ জুলাই জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার বিল পাস হয়। এই বিলে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বেসামরিক প্রশাসনে ঢালাও ভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ প্রকাশ্যে না হলেও পর্দার অন্তরালে সামরিক আইন ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যান। এ বিলের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তীব্র বিরোধিতা করে। তারা ১৯৮৭ সালের ১২ ও ১৩ জুলাই দুই দিনের সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ফলে শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ। এতে নিহত হয় ১০ জন এবং ২০০ জন আহত হয় এবং ১০০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়।[৫২] এর প্রতিবাদে জোটবদ্ধভাবে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৮৭ সালের ২৫ জুলাই একটানা ৫৪ ঘণ্টার হরতাল শুরু করে। এই হরতালেও পুলিশ গুলি চালায় এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন দলের ১০ জন নিহত হন।[৫৩] উল্লেখ্য যে, ১৯৮৭ সালের প্রলয়ংকরী বন্যার জন্য এরশাদ শাসন বিরোধী আন্দোলনে কিছুটা ছেদ পড়ে।[৫৪] এ সময় হঠাৎ করেই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংকট দেখা দেয়। ১৯৮৭ সালের ৯ অক্টোবর পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ

ফরহাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কোর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। আবার পার্টির প্রবীন নেতা মণি সিংহও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এভাবে পার্টি সাময়িকভাবে নেতৃত্বহীন অবস্থা অতিবাহিত করে।[৫৫]

এরপরও পার্টি ১৯৮৭-৮৮ সালে এরশাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এক দফা দাবিতে তীব্র ও ব্যাপক গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের প্রথম দিকে শ্রমিক কর্মচারীসহ শহরাঞ্চলের জনগণের বিভিন্ন অংশের ব্যাপক অংশগ্রহণ, খাস জমি ও অন্যান্য দাবিতে ক্ষেতমজুর কৃষকসহ গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়। আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান তীব্রতার মুখে সরকার পিছু হঠতে বাধ্য হয়। জেলা পরিষদ বিল, জাতীয় তদন্ত ও সমন্বয় সংস্থা অধ্যাদেশ বাতিল, বাজেট সংশোধন এবং শ্রমিক কর্মচারীদের কিছু দাবি মেনে নেয়ার ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সরকার-বিরোধী মনোভাব প্রবল হয় এবং জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের পদত্যাগের দাবিটি আন্দোলনের জনপ্রিয় দাবিতে রূপান্তরিত হয়।[৫৬] এরশাদ সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবি আন্দোলনের প্রধান দাবি হলেও আন্দোলনকে কেবল এই এক দফায় সীমাবদ্ধ না রেখে পার্টি এই আন্দোলনকে ১৯৮৭ সালের চতুর্থ কংগ্রেসে গৃহীত কৌশল অনুযায়ী বিকল্প ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৫৭]

১৯৮৭ সালের ১৬ আগস্ট ৮ দলীয় জোট ও ৭ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের পদত্যাগের জোর দাবি জানানো হয়। আর চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের ধারাবাহিক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ঢাকা অবরোধ কর্মসূচির পূর্বে দুই নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং একটি যুক্ত ঘোষণা প্রদান করেন। ঘোষণায় বলা হয়, এরশাদ শাসনের পতন অত্যাসন্ন। এতে জনমনে উৎসাহ সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যাশা বৃদ্ধি পায়।[৫৮]

এ অবস্থায় সরকার দমননীতির আশ্রয় নেয় এবং সহিংস উপায়ে আন্দোলন মোকাবিলা শুরু করে। ১৯৮৭ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে দেশব্যাপী হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার ও তল্লাশি শুরু করা হয়। এর প্রতিবাদে পরের দিন অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর তিন জোট উপজেলা ঘেরাও করে। ২৮ অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৭টি কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠন রাজপথ-রেলপথ অবরোধ করে।[৫৯]

রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি বানচাল করার জন্য কর্মসূচির দিনে বাইরে থেকে ঢাকায় বিক্ষোভকারী আনার পথ বন্ধ করে দেন। এ দিন পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত হন, এর মধ্য দুই জন ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।[৬০] ১০ নভেম্বরের পর থেকে ১৯৮৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত একের পর এক লাগাতার হরতালের কর্মসূচি দেয় রাজনৈতিক দলগুলো।[৬১] জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের

সরকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার সপ্তাহখানেক পরেই এরশাদ বিরোধী ১০ জন জামায়াতি ইসলামী সংসদ সদস্য এক যোগে পদত্যাগ করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে রাষ্ট্রপতি এইচ. এম. এরশাদ ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন। ঐ সময় দেশে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়।[৬২]

১৯৮৭ সালের ১১ ডিসেম্বর ঘরোয়াভাবে রাজনীতির অনুমোদন দেওয়া হলে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ঘরোয়াভাবে তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮৮ সালের ১ জানুয়ারি ঘোষণা করা হয় ১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ সকল বিরোধীদল সংসদ নির্বাচন বয়কট করে। কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক সাইফুউদ্দিন আহমেদ মানিক এক ঘোষণায় উল্লেখ করেন,

> আমরা (কমিউনিস্ট পার্টি ও ৮ দলীয় জোট) এই নির্বাচনকে বয়কট করবো এবং সকল রাজনৈতিক দলকে এ নির্বাচন বয়কটের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। দেশের এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে এরশাদ সরকারকে প্রথমেই একজন নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এরশাদ সরকারের পদত্যাগের পর উক্ত নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে দেশের চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তাতে আমরা (কমিউনিস্ট পার্টি ও ৮ দলীয় জোট) অবশ্যই অংশগ্রহণ করবো।[৬৩]

১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে অন্তবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ সকল বিরোধীদল প্রত্যাখ্যান করে। রাষ্ট্রপতি এইচ. এম. এরশাদ বিরোধী দলগুলোকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর জন্য নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। বিরোধী দলগুলো শুধু নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেনি বরং এরশাদের অপসারণের 'এক দফা' দাবিতে অনড় থাকে।[৬৪]

মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। এর মধ্যেই ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ দেশের চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৮ সালের ২২ থেকে ২৪ মে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রস্তাব করা হয়, সরকার সংবিধান সংশোধনের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। খুব শীঘ্রই ৮ দলীয় জোট ও বিরোধী দলীয় জোট ও অন্যান্য দলগুলোকে সাথে নিয়ে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন শুরু করতে হবে।[৬৫]

জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে যুগোপযোগী করার জন্য কর নীতি ও আমদানি-রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করেন। এরশাদ সরকার কর্তৃক এসব নীতি গ্রহণের ফলে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কারণ এসব নীতির ফলে দেশের সাধারণ জনগণের

জীবনযাপনের মানোন্নয়নে কোনো কাজে আসে না বরং দেশে নতুন ধরনের এক ধনিক শ্রেণির উদ্ভব হতে থাকে। ফলে সাধারণ জনগণ এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে।[৬৬]

১৯৮৮ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে দেশে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি তখন আন্দোলনের কৌশল পরিবর্তন করে বন্যার্তদের পাশে গিয়ে সহযোগিতা করে। কিন্তু সে সহযোগিতা পর্যাপ্ত হয় না। ফলে ত্রাণসামগ্রীর অভাবে ও ত্রাণ সমাগ্রী বিতরণে ব্যাপক অনিয়মের কারণে জনগণ সরকারের প্রতি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ১৯৮৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করে।[৬৭]

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৮৮ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আন্দোলন স্তিমিত হবার কারণ বশি্লষেণ করে এবং আন্দোলনকে পুনর্গঠনের জন্য কতকগুলো রণকৌশল নির্ধারণ করে। রণকৌশলসমূহ হলো :

১ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলা;
২ ১৫ দলকে সংহত ও অগ্রসর করা;
৩ বাম সমঝোতাকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া;
৪ পার্টির নিজস্ব উদ্যোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা এবং পার্টির উদ্যোগে জাতীয়, আংশিক ও স্থানীয় ভিত্তিতে প্রচার ও ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলা;
৫ একই সাথে গণসংগঠনগুলোর উদ্যোগে জাতীয় ও স্থানীয় ভিত্তিতে আংশিক ও ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন সংগ্রাম যথাসম্ভব বেগবান করার কর্তব্য স্থির করা।[৬৮]

উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ দ্বারা এ সময়ে আন্দোলন পুনর্গঠিত হয়নি। বরং রাজনৈতিক জোটগুলোর সমঝোতা ভেঙে পড়ে এবং সে সঙ্গে এসব দাবিও কার্যকারিতা হারায়। ১৯৮৭-৮৮ সালের এ অবস্থার জন্য কমিউনস্ট পার্টি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-র মধ্যকার সম্পর্কের অবনতিকে দায়ী করে। উল্লখে্য, স্বৈরাচারের আন্দোলনের শক্তিকে পরাভূত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প পন্থা নেই বলে মনে করা হয়। কিন্তু যে পটভূমিতে ১৯৮৭-৮৮ সালের আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯৮৮ সালের অবৈধ পার্লামেন্ট নির্বাচনের পর তা শক্তিভারসাম্যের পরিবর্তন, বড় দলগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি, জনমনে সৃষ্ট হতাশা ও আস্থার সংকট এবং সরকারের আপেক্ষিক সংহত অবস্থান প্রভৃতি কারণে পরিবর্তিত হয়।[৬৯]

১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরের শেষার্ধ থেকে ১৯৮৯ সালের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির শাখা সম্মেলনসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সম্মেলনে পার্টি ও গণসংগঠনসমূহের উদ্যোগে রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সংগঠনের মান উন্নত ও বিকশিত করাসহ বহুবিধ বিষয় আলোচনা করা হয়। মূলত, চলমান আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করাই

ছিল এ সম্মেলনের লক্ষ্য। এছাড়া, আন্দোলন সংগ্রাম ও সংগঠনগত কাজের পর্যালোচনা, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা, নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টিসহ জেলা পর্যায়ে নির্বাচনমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।[৭০]

১৯৯০ সালের গণ আন্দোলন ও এরশাদ সরকাররে পতন

১৯৮৯ সালের বাজেটকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গণআন্দোলন মারমুখী গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হতে থাকে। বাজেট বিরোধী আন্দোলন শেষ হতে না হতেই সরকারের মধ্যপ্রাচ্য নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ১৯৯০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল ঘ◌োষণা করা হয় এবং ১০ অক্টোবর সচিবালয় অবরোধের কর্মসূচি দেওয়া হয়।[৭১]

উল্লখিতি পটভূমিতে ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর সবিচালয় অবরোধ কর্মসূচির মাধ্যমে স্বৈরাচারী এরশাদ শাসনের বিরূদ্ধে সংগ্রামের নতুন পর্বের সূচনা হয়। সেদিন থেকেই আন্দোলন ক্রমাগত বেগবান হয়ে উঠতে থাকে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কয়েকটি হরতালসহ রাজপথ, রেলপথ অবরোধের কর্মসূচি সফলতার সাথে পালন করে। কিন্তু এসময় ভারতের অযোধ্যায় বাবরি মসজদি হামলাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ঢাকার সব এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হয়। এছাড়া রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ বিভিন্ন জায়গায় সভা সমাবেশে গোলযোগ সৃষ্টিকারী সমাজবিরোধীদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে ঘোষণা দেন।[৭২] ৭ দল, ৮ দল, জামায়াতে ইসলামী, ৬ দল ও ৫ দলসহ সকল রাজনৈতিক জোট মনে করে রাষ্ট্রপতির কারফিউ জারি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র।[৭৩]

১৯৯০ সালে ২০ ও ২১ নভেম্বর বরি◌োধী দলসমূহ ৪৮ ঘণ্টার লাগাতার হরতালের প্রস্তুতি নেয়।[৭৪] ১০, ১১ ও ১২ ডিসেম্বর সারা দেশে সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচিসহ ধারাবাহিক সংগ্রামের কর্মসূচি সামনে রেখে গণসংগ্রাম অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হতে থাকে।[৭৫]

ক্রমবর্ধমান গণসংগ্রামের কারণে রাষ্টপ্রতি এইচ. এম. এরশাদ সরকার মরিয়া হয়ে দমনপীড়ন তীব্রতর করে তোলে। ছাত্র সমাজকে পর্যুদস্ত ও ছত্রভঙ্গ করার জন্য ১৯৯০ সালের ১৭ নভেম্বর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে কিছু বেআইনি অস্ত্রধারী মাঠে নামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক সশস্ত্র হামলা এবং সবশেষে ২৭ নভেম্বর ডা. মিলনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশের জনগণ একত্র হয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কাজ করে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ সরকার ২৭ নভেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। ঢাকাসহ বড় বড় শহরে কারফিউ জারি করা হয়।[৭৬] জোটসমূহ জরুরি আইন ও কারিফউ অমান্য করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দ্রুত সাংবাদিক সম্মেলন করে জনগণের প্রতি আহ্বান জানায় এবং লাগাতার হরতালসহ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে।[৭৭] ১৯৯০ সালের ৩০ নভেম্বর সকাল থেকেই শুরু হয় ব্যাপক উত্তেজনা। এই দিন প্রেসক্লাবের সামনে নারী সমাজের

মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তাদের মৌন মিছিলটির ওপর পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে। এই খবর ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ামাত্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। গভীর রাত পর্যন্ত এই মিছিল অব্যাহত থাকে। ১৯৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তা চূড়ান্ত বিস্ফোরণে রূপ নেয়। ১৯৯০ সালের ১ ডিসেম্বর হরতালের সমর্থনে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় ৭৫ জন নিহত হয় এবং ৬০০০ জনের মতো আহত হয় এবং গ্রেফতার করা হয় ৫২,০০০-এর বেশি লোককে।[৭৮] রাষ্ট্রপতি এইচ. এম. এরশাদ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সেনাবাহিনীর দ্বারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা চালান। এছাড়া বিদেশী সাহায্যেরও চেষ্টা তিনি করেন। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তিন জোট মনোনীত নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নিকট রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। এভাবে অবসান হয় এরশাদ শাসনামলের।[৭৯]

উপসংহার

১৯৮০-এর দশকের বাংলাদেশের গণআন্দোলন ছিল স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের এক ঐতিহাসিক জাগরণ, যার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্বাধীনতা, সাম্য এবং গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই জাগরণের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি ছিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি। তারা শুধু রাজনৈতিক মঞ্চে নয়, বরং তৃণমূল পর্যায়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিয়ে আন্দোলনকে একটি বৃহত্তর গণজাগরণে রূপান্তরিত করে।[৮০]

এরশাদবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি দেখিয়েছে যে সাহসিকতা, আদর্শবাদ এবং সংগঠিত নেতৃত্ব কীভাবে একটি দমন-পীড়নের শাসনের অবসান ঘটাতে পারে। জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের অসামান্য ত্যাগ ও সংগ্রামের জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[৮১] তাদের সংগ্রামী নেতৃত্ব ও সাহসিকতা শুধু স্বৈরাচারের পতনই ঘটায়নি, বরং গণতান্ত্রিক চেতনার পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। জনগণের মুক্তি ও সাম্যের যে লড়াই তারা চালিয়েছিল, তা শুধু ইতিহাসের এক অধ্যায় নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি প্রেরণামূলক উদাহরণ। কমিউনিস্ট পার্টির এই ভূমিকা একটি মুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্নকে শক্তিশালী করেছে এবং এই ভূমিকা ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যতেও বাঙালি জাতির জন্য প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।

তথ্যনির্দেশ

১ M. B. Rao (ed.), *Document of the History of the Communist Party of India*, Vol. VII, 1948-1950 (New Delhi: People's Publishing House, 1976), pp. 1-118
২ মর্তুজা খালেদ, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বাম আন্দোলনের বিকাশধারা এবং রাজশাহী জেলা* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০২২), পৃ. ৭২-৭৩
৩ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ২য় খন্ড* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ৪৩০-৩৫
৪ খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৯৯৬), পৃ. ১১
৫ মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম* অখণ্ড, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২য় সংস্কারণ, ১৯৯২), পৃ. ১৯০
৬ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রথম কংগ্রেসে গৃহীত, 'কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট : ১৯৫৬ সালের জুলাই হইতে ১৯৬৮ সালের জুন পর্যন্ত', ১৯৬৭, পৃ. ১০
৭ আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা* (ঢাকা : পড়ুয়া, ১৯৯৭), পৃ. ৫৯-৬০
৮ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ২য় কংগ্রেস রিপোর্ট, ১৯৭২। মর্তুজা খালেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮
৯ মর্তুজা খালেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৯
১০ মো: আব্দুল আলীম, *বাংলাদেশের বাম রাজনীতি বিভ্রান্তি ও বিভক্তি* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ ২০১৮), পৃ. ১০৪
১১ আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, (রংপুর : টাউন ষ্টোর্স, ২০০৩), পৃ. ২২০
১২ মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *স্বৈরশাসনের নয় বছর (১৯৮২-৯০)*, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২), পৃ. ৫১
১৩ *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২১ নভেম্বর ১৯৮৬
১৪ গবেষক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার: মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, তারিখ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১, স্থান : পুরানা পল্টন, মুক্তিভবন, ঢাকা
১৫ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাব*, ১৯৮৩, পৃ. ৮-৯
১৬ সাক্ষাৎকার: মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, *পূর্বোক্ত*
১৭ মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *একাশির রক্তাক্ত অধ্যায়*, (ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ২০০২), পৃ. ৬৯
১৮ *দৈনিক সংবাদ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩
১৯ পূর্বোক্ত
২০ সাক্ষাৎকার : মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, *পূর্বোক্ত*
২১ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস রিপোর্ট*, ১৯৮৭
২২ মেজর রফিকুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫
২৩ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে রিপোর্ট*, ১৯৮৭
২৪ পূর্বোক্ত
২৫ *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ মার্চ ১৯৮৫
২৬ *সাপ্তাহিক একতা*, ৮ মার্চ ১৯৮৫
২৭ পরেশ সাহা, *বাংলাদেশ : ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, এরশাদ পর্ব*, (ঢাকা : জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ১৯৯৭), পৃ. ৫৫-৫৬
২৮ *দৈনিক সংবাদ*, ২৪ মার্চ, ১৯৮৫
২৯ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮
৩০ পূর্বোক্ত
৩১ *সাপ্তাহিক একতা*, ৩ মে ১৯৮৫
৩২ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস রিপোর্ট*, ১৯৮৭
৩৩ *দৈনিক সংবাদ*, ১২ এপ্রিল, ১৯৮৬
৩৪ *দৈনিক সংবাদ*, ৩ মে, ১৯৮৬
৩৫ *দৈনিক সংবাদ*, ৬ মে ১৯৮৬
৩৬ *দৈনিক সংবাদ*, ৮ মে ১৯৮৬

৩৭ *দৈনিক সংবাদ*, ৯ মে ১৯৮৬
৩৮ *'জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৮৬, সাধারণ সম্পাদকের পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন (গোপনীয়)।'* বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, আগস্ট ১৯৮৬
৩৯ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভায় গৃহীত সাধারণ সম্পাদকের পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন*, ১৯৮৬
৪০ পূর্বোক্ত
৪১ *The Guardian*, 14 October 1986
৪২ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭
৪৩ *The Guardian*, 17 October 1986
৪৪ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯
৪৫ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস রিপোর্ট*, ১৯৮৭, পৃ. ১২
৪৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
৪৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
৪৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭
৪৯ *দৈনিক সংবাদ* ২৮ জুন, ১৯৮৭
৫০ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০
৫১ *দৈনিক সংবাদ*, ২৮ জুন, ১৯৮৭
৫২ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০-৭১
৫৩ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ জুলাই, ১৯৮৭
৫৪ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস রিপোর্ট*, ১৯৯১
৫৫ পূর্বোক্ত
৫৬ পূর্বোক্ত
৫৭ পূর্বোক্ত
৫৮ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২
৫৯ *দৈনিক সংবাদ*, ২৭, ২৯ অক্টোবর, ১৯৮৭
৬০ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি পঞ্চম কংগ্রেস রিপোর্ট*, ১৯৯১
৬১ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫
৬২ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৭
৬৩ *দৈনিক সংবাদ*, ৬ জানুয়ারি ১৯৮৮
৬৪ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫, ৭৬
৬৫ *দৈনিক সংবাদ*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
৬৬ পূর্বোক্ত
৬৭ *দৈনিক সংবাদ*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
৬৮ পূর্বোক্ত
৬৯ পূর্বোক্ত
৭০ লিফলেট: *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, আঞ্চলিক ও শাখা সম্মেলন সম্পর্কিত নোট*, ১৯৮৮
৭১ *দৈনিক সংবাদ*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯০
৭২ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২ নভেম্বর ১৯৯০
৭৩ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ নভেম্বর ১৯৯০
৭৪ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১১ নভেম্বর ১৯৯০
৭৫ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস*, ১৯৯১
৭৬ *দৈনিক সংবাদ*, ২৮ নভেম্বর ১৯৯০
৭৭ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস*, ১৯৯০

৭৮ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭।
৭৯ *বাংলার বাণী*, ৫, ৬, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০
৮০ সাক্ষাৎকার : মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, *পূর্বোক্ত*
৮১ পূর্বোক্ত